Vol. 29 | No. 1 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা : পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার পদ্ধতি

Volume	29
Issue	1
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কল্পনা ভৌমিক
Published online	October 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v29i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i1.6
Pages	165-178
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা : পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার পদ্ধতি

কল্পনা ভৌমিক

আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব স্বীকারে পূর্বপুরুষদের অবদান যেমন নিঃসন্দেহ তেমনি বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির গুরুত্বও— অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। প্রাচীনযুগ আজকের মত যন্ত্রমুখর ছিল না বলে তখন কবি-প্রতিভার প্রকাশ হতো গাছের বাকল, ভূর্জ-পত্র ইত্যাদিতে। আর তা লিখিত ও অনুলিপিকৃত হতো হাতেই। তাই এর নাম পাণ্ডুলিপি বা পুথি। এই পাণ্ডুলিপিগুলো কিছুটা বিকৃতি (লিপিগত, ভাষাগত ও বানানগত) স্বীকার ক'রে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন লিপিকরদের হাতে লিপিকৃত হতে হতে আমাদের সময় পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সক্ষম হচ্ছে না তার অস্তি-ত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে আমাদের বিদ্বৎসমাজে। এর মুখ্য কারণ পাঠো-দ্ধারের জটিলতা। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি যে অক্ষরে লেখা হয়েছে তা বর্তমান বাংলা লিপির অঙ্কুরাবস্থা। আজ আমাদের সংগ্রহে যে সব বাংলা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রয়েছে তার সিংহভাগ বাংলা হরফে লেখা। কিছু কিছু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দেবনাগরী (সংস্কৃত) অক্ষরে লেখা দেখা যায়। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত এই প্রাচীন বাংলালিপি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে করতে আধুনিক বাংলা-বর্ণের আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন সময়ের এইসব পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন কবিগণ তাঁদের প্রতিভাপ্রসূত যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন তার কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে, তবে অধিকাংশই রয়ে গেছে অজানার অন্ধকারে। এই রত্নরাজীকে অজানা থেকে জানার আলোকে প্রকাশ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে দেখা যাবে——প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য বিশ্বের

অন্যান্য ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। প্রাচীন ভারতের প্রধান ভাষা ও সাহিত্য ছিল সংস্কৃত। তখনকার বিদগ্ধ-ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায়ই তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিতেন। এই ভাষায় রচিত হয়নি---জ্ঞানের এমন কোন দিক বা বিষয় নেই। বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, চিকিৎসা, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইতিহাস, রাজনীতি---কোন বিষয়েই এ ভাষার রচনা উপেক্ষণীয় নয়। কৌটিল্যের (চাণক্য) 'অর্থশাস্ত্র' বিশ্বরাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে অভিনন্দিত, তবে এ সবের অধিকাংশই আজও আবদ্ধ রয়েছে প্রাচীনকালের হাতে লেখা সেই পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায়। কিছু কিছু অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার-দুরূহ বেড়া ডিঙ্গিয়ে আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পাতায় আপন স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মোট পাণ্ডুলিপির তুলনায় প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা খুবই নগণ্য। সমস্ত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলো যেদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারবে সেদিন বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখবে----বিশ্ব সাহিত্যে আজ যে ক'টি ভাষা ও সাহিত্য বিপুল ঋদ্ধির দাবীদার, তাদের তুলনায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য কোন অংশেই কম ঋদ্ধ নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে যা-কিছু রচিত হয়েছে তা সবই হয়েছে প্রাচীন যুগের হস্তলিখিত সেই পাণ্ডুলিপিতে। ছাপাখানা প্রবর্তনের পরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্পাদকের হাতে নানা ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি আমরা জানিনা কত নাম না জানা কবির কাব্য, কত গূঢ়রহস্য, কত মূল্যবান বিষয় পাণ্ডুলিপির ধূলার স্তূপে আত্মগোপন করে আছে। পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ব্যতীত এগুলো আমাদের কাছে থেকেও নেই, এগুলো মূল্যবান হয়েও মূল্যহীন। আমাদের বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। সংগ্রহের পরিমাণও নিদেনপক্ষে কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়----বিভাগপূর্ব বাংলায় দুই একজনের নাম ছাড়া বিভাগোত্তর বাংলাদেশে কোন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে যে পণ্ডিতের অভাব তা নয়, তবে অভাব রয়েছে পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার

চর্চার প্রয়াসের। সংস্কৃত ভাষা যেমন একটু কঠিন তেমনি জটিল তার পাণ্ডুলিপির লিখন পদ্ধতি, তাই স্বভাবতই সাধারণ পাঠকদের কাছে এক দুর্ভেদ্য কুহেলিকার সৃষ্টি করে রেখেছে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি-গুলো। তবে কোন জটিলতাই যে আর জটিল থাকে না——এর প্রমাণ আধুনিক বিশ্ব সব কিছুতেই রাখছে। পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেও এ সত্যের প্রমাণ দেখব বলে আমরা আশাবাদী। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অনুশীলন এবং তার সুবন্দোবস্ত করা। আমাদের দেশের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির তিনভাগের দুইভাগই সংস্কৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রায় চল্লিশ হাজার পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিশ হাজার সংস্কৃত, দশ হাজার বাংলা এবং বাকী দশ হাজার আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দি। এমনি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, যেমন——কুমিল্লার রামমালা, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকার জাতীয় যাদুঘর, বাংলা একাডেমী ইত্যাদি জায়গায় পাণ্ডুলিপির প্রচুর সংগ্রহ রয়েছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে গবেষণা করা, সঠিকভাবে এদের পাঠোদ্ধার করার মত লোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুই একজন ব্যতীত অন্য কোথাও নেই বললেই চলে। কিন্তু আধুনিক যুগের অর্থাৎ যে সভ্যতার যুগে মানুষ তার অতীত ইতিহাসকে জাতির সর্ব-শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করছে এবং তারই সন্ধান করতে গিয়ে হাজার হাজার ফুট মাটির গভীরে খনন করে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, সেই যুগের বৈশিষ্ট্য তো এটা নয়। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাংলা পাণ্ডুলিপির স্বল্পতা সত্ত্বেও) বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা এবং পঠন-পাঠনের বেশ অনুশীলন শুরু হয়েছে। পাঠসমালোচনা-বিদ্যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলা সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমালোচনা বিষয়টি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির এত বিশালতা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংস্কৃত বিভাগ-গুলো আজও এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করছে না। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার ব্যাপক স্বার্থে পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার এবং এর গবেষণা কার্যে সহযোগিতা কল্পে এক বিরাট ভূমিকা থাকা উচিত ছিল সংস্কৃত বিভাগগুলোর। যাই হোক, অবলুপ্তির পথে অগ্রসরমান আমাদের এই সঞ্চিত সম্পদের সঠিক মর্যাদাদানে সংস্কৃত বিভাগগুলো বিশেষ করে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা পোষণ করতে পারি।

সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার-পদ্ধতি

অধিকাংশ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিই বাংলা হরফে লেখা। অবশ্য কিছু কিছু দেবনাগরী অক্ষরেও লেখা হয়েছে। যে বাংলা হরফ বা লিপিতে পাণ্ডুলিপিগুলো লিখিত হয়েছে তা প্রাচীন লিপি। প্রাচীন বাংলা লিপি ও আধুনিক বাংলা লিপির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট কালিক ব্যবধান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লিপিকৃত হয়েছে এই পাণ্ডুলিপিগুলো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে লিপি-বৈশিষ্ট্যেরও হয়েছে পরিবর্তন। তাই এক শতকের পাণ্ডুলিপির সাথে অন্য শতকের পাণ্ডুলিপির বেশ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ কালের বিবর্তনের সাথে বিবর্তিত হয় মানুষের রুচি ও হস্তকৌশলের। মানুষের চিন্তা ধারারও পরিবর্তন ঘটে সময়ের পরিবর্তনে। ফলতঃ এইসব পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে তার কাজে-কর্মেও। লিপির এই বিবর্তনহেতু আধুনিক বর্ণমালার অভিধানের মত পাণ্ডুলিপির বর্ণমালার একটি অভিধান তৈরী করা কঠিন ব্যাপার। যদি করতেই হয় তাহলে করতে হবে প্রতি শতকের একটি করে। কোন ভাষা শিখতে হলে প্রথমেই পরিচিত হতে হয় তার বর্ণমালার সাথে। পাণ্ডুলিপি লিখতে হলেও প্রথমে তার বর্ণমালার পরিচয় জ্ঞান থাকতে হবে। এই মর্মে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাচীনতম যে-যে শতকের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় সেই থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রতি শতকের একটি করে বর্ণমালার ছক নিম্নে প্রদর্শিত হল। এর দ্বারা পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারে আগ্রহী পাঠকদের পাণ্ডুলিপির সাথে সুলভ-পরিচয় ঘটবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে প্রাচীন যে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা হলো পনের শতকের , তাই পনের শতক থেকেই আমরা বর্ণমালার ছক শুরু করছি। এখানে উল্লেখ্য, একই শতকে (প্রথম এবং শেষদিকে) কয়েক রকমের বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। যে বর্ণগুলি একটু বেশী প্রচলিত এবং এক শতক থেকে অন্য শতকে কিছুটা সাদৃশ্য বজায় রেখে চলেছে সেই বর্ণগুলিই আমি আপাততঃ ছকে প্রদর্শিত করছি :

১৫ শতক
১৬ শতক
১৭ শতক
১৮ শতক
১৯ শতক
অ
আ
ই
ঈ
উ
ঊ
ঋ
এ
ঐ
ও
ঔ
ক
খ
গ
ঘ
ঙ
চ
ছ
জ
ঝ
ঞ
ট
ঠ
ড
ঢ
ণ
ত

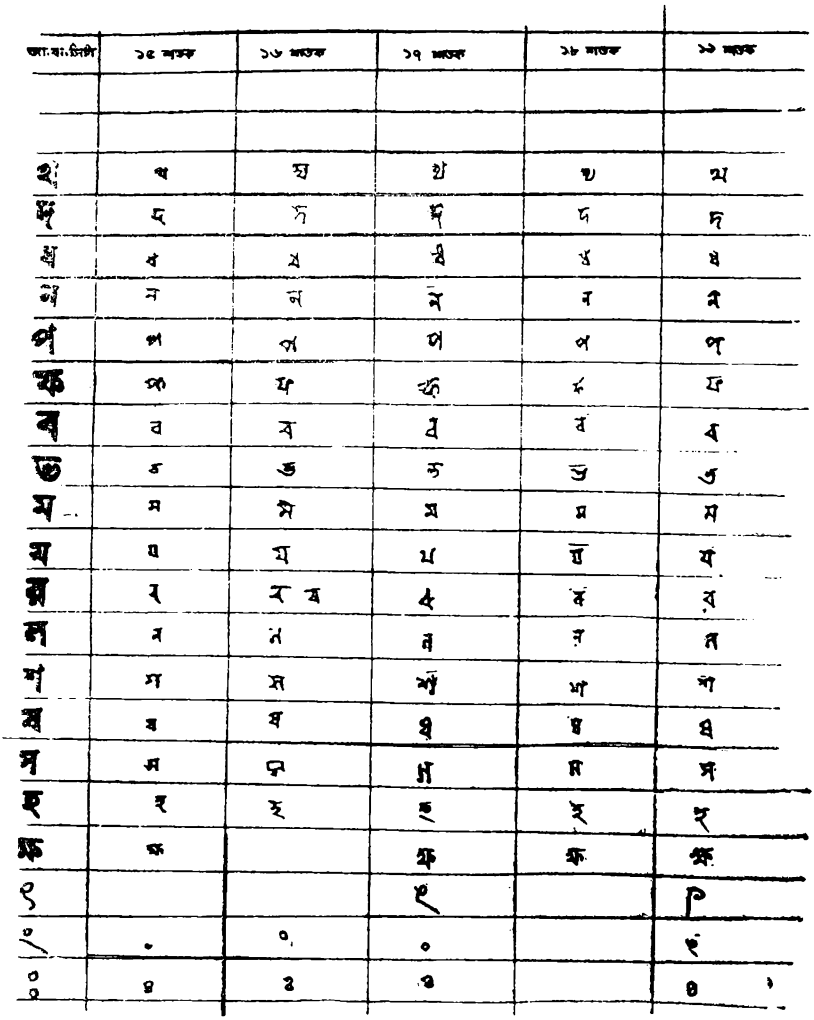

পাঠ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আক্ষরিক এবং চিহ্নমাত্রিক শিক্ষা

যে কোন পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধার করতে হলে ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং প্রবল আগ্রহসহকারে পাঠ করতে হবে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, পাণ্ডুলিপির কোন বর্ণ, কোন চিহ্ন অর্থহীন নয়। তাই প্রতিটি পত্রের প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি চিহ্ন সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

পাণ্ডুলিপি সাধারণত দুই পৃষ্ঠায়ই লিখিত হয়। কিন্তু পত্রাঙ্ক দেয়া হয় একপৃষ্ঠায়। যে পৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক দেয়া হয় সেই পৃষ্ঠা দ্বিতীয় এবং পত্রাঙ্কহীন পৃষ্ঠা প্রথম হিসেবে গণ্য হয়। পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুমাত্রিক ও পূর্ণমাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক শব্দটি উদ্ধার করতে হবে। অনুমানের দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এর ফলে অর্থের ভিন্নতা দেখা দিতে পারে। (১ নম্বর তথ্য নির্দেশে দ্রষ্টব্য)[১] এখানে প্রথমে দেখতে হবে বর্ণটা কি, অন্য কোন্ বর্ণ এসে ঐ বর্ণের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে সম্ভাব্য কি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। এভাবেও সম্ভব না হলে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটির উপর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে এরূপ শব্দ আর কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপর্যুক্ত 'দ' ও 'ন'—এর মত আপাত-দৃষ্টিতে একই রকম বর্ণ পাণ্ডুলিপিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে (দৃষ্টান্ত ২ নং তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[২] বিভিন্ন যুক্তবর্ণ এবং স্বরবর্ণ আপাত-দৃষ্টিতে একই বলে ভ্রম হলেও সূক্ষ্মভাবে দেখলে এদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় লিপিকর দুটো বর্ণের সাদৃশ্যের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। তাই পার্থক্য নির্দেশের জন্য বর্ণের উপর বিভিন্ন চিহ্ন (' . ', ' / ') ব্যবহার করেছেন (দৃষ্টান্ত ৩ নং তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[৩]

একটা পুরো শব্দ লিখতে গেলে তার সাথে 'া', 'ি', 'ু', 'ূ', 'ৃ', 'ে'—কার এবং বিভিন্ন 'ফলা' যুক্ত হয়। পাণ্ডুলিপিও এই নিয়ম বহির্ভূত নয়। তাই সেখানে এই বর্ণগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাও সবিশেষ লক্ষণীয়। অনেক পাণ্ডুলিপিতে 'া'-কার এবং 'ে'—কারের পার্থক্য নির্ণয় করতে বেশ হিমশিম খেতে হয়। 'া'—কার অনেক সময় একটু বেঁকে 'ে'--কারের মত হয়ে গেছে। কিংবা 'ে'-কার না বেঁকে 'া'-কারের রূপ ধারণ করেছে। 'া'—কার এবং 'ি'-কারের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। অনেক পুথিতে 'ি'কারের উপরের বাঁকা অংশটা বাদ দিয়ে অনেকটা 'া'—কারের মত করে 'ি'-কার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোন কোন পুথিতে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য 'ি'-কারের উপরের অংশের বিনিময়ে ভিতরের দিকে একটা টান দিয়ে 'ি'-কার বুঝানো হয়েছে।

বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে একটু কঠিন ও জটিল মনে হবে তবে অন্তর্দৃষ্টি খুলে সচেতনতার সাথে পরীক্ষা করলে পার্থক্য অবশ্যই চোখে পড়বে। (দৃষ্টান্ত ৪ নং তথ্য নির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[৪] এই 'বানান' বর্ণগুলো কোন শতাব্দীর বিবর্তন ধারায় পড়ে না। অতি প্রাচীন যুগে কি ছিল তা জানা যায় না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পনের শতকের পুথি থেকে আঠারো শতকের পুথিতে এই দুটো ধারারই প্রচলন দেখা যায়। অবশ্য একটা পুথিতে দুটোরীতি এক সাথে ব্যবহৃত হয়নি।

আধুনিক বাংলা লিপিতে প্রতিটি 'বানান', 'ফলা' সুস্পষ্টরূপে পৃথক করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনযুগ পার্থক্যকরণ ব্যাপারে এতটা সচেতন ছিল না। ফলে আধুনিক যুগের পাঠকরা পাঠোদ্ধারকালে এই অসচেতনতার স্বীকার হচ্ছে প্রতিক্ষেত্রে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির 'উ'-কার এবং 'ব'-ফলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একই 'ব' বর্ণদ্বারা 'উ'-কার এবং 'ব'-ফলা নির্দেশিত হয়েছে। (দৃষ্টান্ত ৫ নম্বর তথ্য-নির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[৫] এক্ষেত্রে উক্ত লাইনের আগে-পরের শব্দের অর্থানুযায়ী সঠিক পাঠটি উদ্ধার করতে হবে। এই রীতি সম্ভবত ১৫ শতকের পূর্বে বেশী মাত্রায় প্রচলিত ছিল। ১৫ শতকের প্রথমদিকের পুথিতে এই রীতিরই প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু পনের শতকের শেষ দিকের কোন কোন পুথিতে এই রীতির সাথে '◌ু'—কারের এই নিদর্শন একটু-আধটু দেখা যায়। তবে ১৬ শতক থেকে কম-বেশী দুটো রীতিরই ব্যবহার দেখা যায়। বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে একটি রীতি আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে একসাথে দুটো রীতিরই ব্যবহার হতে হতে ১৮ শতক পর্যন্ত পৌঁছেছে। ১৯ শতকে এসে 'ব' রীতি লোপ পেয়ে '◌ু'-রীতিতে এসে স্থিতি লাভ করেছে।

সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে 'অনুস্বার' (ং) হরফটিও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই অনুস্বার হরফটি একটি ছোট্ট গোলাকার শূন্য চিহ্নের (০) রূপ ধারণ করে বর্ণের মাথার উপর স্থিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারে প্রাপ্ত পনের শতকের পাণ্ডুলিপি থেকে দেখা যায় এই 'অনুস্বার' হরফটি (বর্ণের ঠিক মাথা সোজাসুজি উপরে না থেকে) বর্ণের উপরে একটু ডান পার্শ্বে কাঁধ বরাবর লিখিত হয়েছে। (দৃষ্টান্ত ৬ নম্বর তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[৬] অনুস্বার হরফের এই আদলটি চলেছে ১৬ শতক পর্যন্ত।

১৭ শতকের দিকে এই হরফটি আর একটু ডানদিকে সরে গিয়ে এবং তারও কিছু কাল পরে একটু নীচে নেমে অবস্থান করেছে। (দৃষ্টান্ত ৭ নং তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[৭] এইভাবে একটু একটু করে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হতে হতে ১৯ শতকে এসে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই আদলটির নীচে একটা বাঁকা ও লম্বা টান '্' (বর্তমান আধুনিক বাংলা হরফের মত) ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই শতকে একই পুথিতে দুটো রীতির প্রচলনই বেশ দেখা যায়। (দৃষ্টান্ত ৮ নম্বর তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[৮] অনুস্বার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির অনুস্বারের সাথে বাংলা পাণ্ডুলিপির অনুস্বারের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেছে যে বিষয় তাহলো—যুক্তবর্ণের ব্যবহার। প্রাচীনযুগ ছিল আধুনিক যুগের বিপরীত। তাই বর্তমান যুগে যেমন চলছে যুক্ত অক্ষর ভেঙ্গে সহজ থেকে সহজতর করার পালা, তেমনি প্রাচীন যুগে ছিল একাধিক বর্ণযোগে যুক্তবর্ণ তৈরী করে তার ব্যবহারের প্রতিযোগিতা। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত পুথি রচয়িতারা নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ও ভাষাবিদ ছিলেন। সেই সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতিযোগিতার ফসল যে কি হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আজ আমাদের এযুগে বসে সেযুগের কবিদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় জানতে তাঁদের রচনার প্রতি লাইনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয় একাধিক বার। অসংখ্য সংখ্যার যুক্তবর্ণ আমাদের দৃষ্টিকে ক'রে তোলে বিভ্রান্ত। একটা বর্ণের সাথে আর একটা বর্ণ এমনভাবে যুক্ত করে লেখা হয়েছে যা সহজ দৃষ্টিতে একটি বর্ণ বলেই ভ্রম হয়। 'ফলা'-যুক্ত যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি ঘটে বেশী। তবে অনুশীলনরে দ্বারা যে কোন বিভ্রান্তির অপনোদন ঘটানো সম্ভব। (দৃষ্টান্ত ৯ নম্বর তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[৯]

এমনিতেই পাণ্ডুলিপির বর্ণগুলো বিদঘুটে, তার উপর যখন সেই বর্ণ অন্য কোন বর্ণের সাথে যুক্ত হয়েছে তখনই তার কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ পড়ে কিম্ভূত-কিমাকার রূপ ধারণ করেছে। ফলে সেই সব যুক্তবর্ণ

স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর। এমন কি 'ফলা' ছাড়া দুটো বর্ণের সংযোগও বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। (দৃষ্টান্ত ১০ নম্বর তথ্য নির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[১০] শুধু দুটো বর্ণের সংযোগই নয়, একাধিক বর্ণের সাথে 'বানান', 'ফলা' যুক্ত করে একটা মাত্র শব্দ তৈরী করার প্রবণতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশী। (দৃষ্টান্ত ১১ নম্বর তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[১১] এখানে চ, ছ, '্র' ও উ-কার ('ু')—এই চারটি বর্ণকে একসঙ্গে ক'রে লেখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদাহরণগুলোও লক্ষণীয়। (দৃষ্টান্ত ১২ নম্বর তথ্যনির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[১২] অসংখ্য যুক্তবর্ণ পাণ্ডুলিপির পত্র-গুলিকে জটিল করে রেখেছে। যেহেতু যুক্তবর্ণ তৈরী করা সংস্কৃত পণ্ডিতদের বৈশিষ্ট্য ছিল সেহেতু শুধু 'বর্ণমালার' সাথে পরিচিত হলেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠ সম্ভব নয়। একটা বর্ণ অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হতে গিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কতটুকু বিকৃতি ঘটেছে প্রতিটি বর্ণ ধরে তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে।

পাঠশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

ইতিপূর্বে পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এবার এর অন্যতম প্রয়োজনীয়তা 'ভাষাজ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তা হল ভাষাজ্ঞান। ভাষার উপর ভালো দখল না থাকলে সেই সব প্রাচীন যুগের মনিষীদের জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। অন্ততঃ সাধারণভাবে পাঠোদ্ধারের জন্যও ভাষার উপর বেশ দখল থাকতে হবে। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত কবিদের লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল দীর্ঘ সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ তৈরী করা এবং এইভাবে যে যত বড় পদ তৈরী করতে পারতো—পাণ্ডিত্যের কৃতিত্ব তার তত বেশী ছিল। এর সাথে তাদের লেখার আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল পরিচিত সহজ শব্দ বর্জন করে অপরিচিত কঠিন শব্দ ব্যবহার করা। যে যত বেশী কঠিন ও অসাধারণ শব্দ ব্যবহার করতে পারতো, ভাষাজ্ঞানের পরিচয় তার তত বেশী প্রকাশিত হত। এই সব বৈশিষ্ট্যের সাথে ছন্দ ও অলংকার মিলে পাণ্ডুলিপির পত্রে পত্রে যে সব দীর্ঘপদ

সৃষ্টি হয়েছে----সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকলে তার ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। (দৃষ্টান্ত ১৩ নম্বর তথ্য নির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[১৩]

এছাড়া আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম শতকে লেখা বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন---উক্ত কথা কতখানি সত্য। 'কাদম্বরী'তে সন্ধি ও সমাস ক'রে ক'রে পদটাকে এত দীর্ঘ করা হয়েছে যে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গেলে পূর্বপ্রান্তের কথা আর মনে থাকে না; এর কর্তা-ক্রিয়াও অনেক সময় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে; এ সব পদের অর্থ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। জার্মান পণ্ডিত গ্যেটের মতে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ভারতীয় গভীর অরণ্যের মত, এর মধ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর, যদিও বা দু'একটা গাছ কেটে কোন রকমে প্রবেশ করা যায় তো 'শব্দরূপ'-ব্যাঘ্রের ভয়ে আর অগ্রগামী হওয়া যায় না।

সংস্কারকৃত 'সংস্কৃত' ভাষা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। যে-'ছকে' সে যুগে সংস্কৃত সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল আজও আমরা সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে গিয়ে সেই ছকের মধ্যেই ঘোরাফিরা করছি। কাজেই যেহেতু সংস্কৃত ভাষার কোন বিবর্তন নেই সেহেতু ভাষাজ্ঞান থাকলে এ যুগে বসেও সে যুগের কবিদের লিখিত কীর্তিকে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। সংস্কৃত পুথির 'লিপি' এবং 'ভাষা' আলাদা হলেও একটি অন্যটির পরিপূরক। যেহেতু 'লিপি' বিবর্তিত সেহেতু তার সাথে সাথে চলে আসা অবিবর্তিত 'ভাষার' মাধ্যমে তার (লিপির) বিবর্তনের ধারা-টিকেও স্পষ্ট করা সম্ভব। অতএব, পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধারের জন্য ভাষা জানতে হবে। বিশেষ করে ব্যাকরণ, কারণ ব্যাকরণের সাথে অপরিচিতি থেকে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে যাওয়া মরু-ভূমিতে বারি সন্ধানের মতই কষ্টদায়ক ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

উপসংহার

ইতিপূর্বে মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা' গ্রন্থে বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার পদ্ধতির উপর বিস্তর আলোচনা

করেছেন। বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠের ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। যদিও বাংলা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি লিপিগত দিক থেকে এক তবুও দুটো ভাষার ব্যবধানের জন্য—এ দুইয়ের লিপির ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছে অনেক পার্থক্য। তাই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থখানি ততটা উপকারী নয় যতটা বাংলার ক্ষেত্রে। সংস্কৃত ও বাংলার পাণ্ডুলিপির মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈশাদৃশ্যের ভাগটাই বেশী। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে বাংলা পাণ্ডুলিপির মত অর্থহীন চিহ্ন নেই বললেই চলে। যেমন——বাংলা পাণ্ডুলিপির 'রেফ্' চিহ্নের বাতুলতা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে নেই। তবে কোন কোন সংস্কৃত পুথিতে প্রতি লাইনের শেষবর্ণের শেষে একটা লম্বা 'টান' দেখা যায়। এটা খুব সম্ভবত কোন বাংলা পুথির লিপিকর একই সাথে বাংলা ও সংস্কৃত পুথি অনুলিপি করতে গিয়ে বাংলার প্রভাবে সংস্কৃতেও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এই নিদর্শন বাংলা পুথির ক্ষেত্রে প্রচুর, কিন্তু সংস্কৃত পুথির ক্ষেত্রে খুবই কম। (দৃষ্টান্ত ১৪ নম্বর তথ্য নির্দেশে দ্রষ্টব্য)।[১৪] সংস্কৃত পুথিতে ব্যাকরণগত অনেক জটিলতা আছে কিন্তু বাংলা পুথির মত একীভূত শব্দের কোন জটিলতা নেই। তখনকার দিনে সংস্কৃত ছিল শিক্ষিতের ভাষা। যারাই লেখাপড়া শিখত তারাই সংস্কৃত নিয়ে চর্চা করত। সংস্কৃত প্রথম থেকেই ছিল একটি সুসংবদ্ধ ভাষা, পক্ষান্তরে প্রাথমিক অবস্থায় বাংলা ছিল অস্তিত্বহীন (অর্থাৎ এর কোন নির্দিষ্ট লিখিতরূপ ছিল না), অসমৃদ্ধ ও সাধারণ লোকের একটা কথ্যভাষা। বাংলা ভাষা পরিবর্তনশীল। তাই সংস্কৃত পুথি যতটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে রচিত হয়েছে, বাংলার পুথির ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। ফলে ভাষা-বিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা পুথিতেও বিভিন্ন বিবর্তনের ও বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। সে বিষয়ের উপরই দৃষ্টি দেয়া যাক। এ যাবৎ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পঠন-পাঠন বিষয়ের উপর কোন আলোচনা--সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়নি। এমনকি আমাদের দেশে এ বিষয়ের কোন আলোচনা পর্যন্ত হয়নি। এটা নিতান্ত অনুতাপের বিষয় হলেও নির্মম সত্য। তবে আমাদের সংস্কৃত চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র 'সংস্কৃত বিভাগগুলো' যদি এর উপর দৃষ্টি দেয় তাহলে হয় তো আর বেশী দিন এই অনুতাপের দহনে

দগ্ধ হতে হবে না। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে আমার এই আলোচনা বিশাল সমুদ্রের এক বিন্দু জলের মতই সংক্ষিপ্ত। তথাপি আশা রাখি—সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে এখানে যা আলোচিত হল এটুকু অনুসরণ করলেও পাণ্ডুলিপি পাঠের পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাবে।

তথ্যনির্দেশ ১২

১. ন্দ (ন্দ), ভ্র (ভ্র)

২. ল (ল), ল (ল), থ (থ), স্থ (স্থ) স্থ (স্থ), রাবনস্য (রাবনস্য) এখানে 'র' ও 'ব' একই রকম, তয়া (তয়া), যস্যা (যস্যা) রামে (রাম) বধ (বধ)

৩. য (য), য় (য়) ল (ল) ন (ন) ফে (ফে) ক (ক), ম্ন (ম্ন), দ্ম (দ্ম) ইত্যাদি।

৪. রাম (রাম), দেব (দেব), পিতৃদেব (পিতৃদেব) ইত্যাদি।

৫. সুন্দ (সুন্দ), কৃষ্ণা (কৃষ্ণা)

৬. বীজং (বীজং)

৭. কথং (কথং), বধং (বধং)

৮. সংযুক্ত (সংযুক্ত), রূপং (রূপং)

৯. ত্য (ত্য), দ্য (দ্য), ক্ক (ক্ক)/ ত্থ (ত্থ) ত্থ (ত্থ) ত্ম (ত্ম), ক্র (ক্র) / স্য (স্য) প্র (প্র) ইত্যাদি

১০. ংস (ংস), ংগ (ংগ), ঞ্চ (ঞ্চ), চ্ছ (চ্ছ), জ্ঞ (জ্ঞ)/ ষ্ট (ষ্ট), ম্ম (ম্ম)/ ন্দ (ন্দ) ল্ল (ল্ল) ইত্যাদি।

১১. ক্ষু (ক্ষু)

১২. হ্রং (হ্রং) শ্রু (শ্রু), শ্রু (শ্রু) ষ্টু (ষ্টু)

১৩ [illegible]
(বিপ্র রাজার [illegible])

১৪. পঞ্চভূতে (পঞ্চভূতে)

তথ্যনির্দেশের অবশিষ্টাংশ

১ ঢা. বি. পু. নং ৪৬০৮
২ ঢা. বি. পু. নং ৩২৩
৩ ঢা. বি. পু. নং ৬৭৮ (প্রকল্প)

১২

৪ ঢা. বি. পু. নং ২৫১১ (প্রকল্প)
৫ ঢা. বি. পু. নং ৩২৩
৬ ঢা. বি. পু. নং ৪৬০৮ (১৫ শতক)
৭ ঢা. বি. পু. নং ৩২৩
৮ ঢা. বি. পু. নং ২৮৯২
৯ ঢা. বি. পু. নং ৪৬০৮/৪৯৫/২৫১১ (প্রকল্প)
১০ ঢা. বি. পু. নং ৪৬০৮/১৪/২৫১১ (প্রকল্প)
১১ ঢা. বি. পু. নং ১৪
১২ ঢা. বি. পু. নং ৪৬০৮
১৩ ঢা. বি. পু. নং ১৪৯ R, (১৯ শতক)
১৪ ঢা. বি. পু. নং ২৫১১ (প্রকল্প)

পাণ্ডুলিপি-সূচি : অমুদ্রিত (পুথি)

১ পুথি নং—৪৯৫/১৫ শতক/মহাভারত, ঢা. বি. পু.
২ পুথি নং—৪৬০৮/১৫ শতক/সারদাতিলক, ঢা. বি. পু.
৩ পুথি নং—৩২৩/১৭ শতক/নরসিংহ পুরাণ, ঢা. বি. পু.
৪ পুথি নং—১৯২/১৭ শতক/তন্ত্রসার, ঢা. বি. পু.
৫ পুথি নং—১৪/১৬ শতক/মহাভারত, ঢা. বি. পু.
৬ পুথি নং—২৫১১/১৮ শতক/নির্ব্বাণতন্ত্র, ঢা. বি. পু. (প্রকল্প)
৭ পুথি নং—১৪৯ R/১৯ শতক/শিশুপালবধ, ঢা. বি. পু,
৮ পুথি নং—২৮৯২/১৯ শতক/মহাভারত, ঢা. বি পু.
(সংকেত : ঢা. বি. পু.=ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি)